“আমার দৃষ্টি তোমার হৃদয়ে বন্ধু, তোমার দৃষ্টি আমার জেবে!!”

সমসাময়িক একটি পর্যালোচনা

“দাদা, ছেলেকে মার্কিন মুল্লুকে বিয়ে দিয়ে সেদিন মাত্র ঘরে ফিরলেন আর এখন ঢাকঢোল পিটিয়ে সিডনীর সকল দেশীভাইদের নেমন্তন দিয়ে একত্র করে বিদেশাগত নববধু ও পুত্রের সাথে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। আয়োজনটা এত ঢাউশ ভাবে না করলেই কি হতো না?”

“এ্যামেরিকায় পকেট ফুটো হয়ে গেছে, খরচের জ্বালায় আছি গো। তাছাড়া আমার একমাত্র ছেলের বিয়েতে আমি যদি সিডনীর সকলকে এখন ডেকে একছাদের নীচে একত্রিত করি তাতে কার কি?”

“না, বলছিলাম কি এটাতো বিয়ে নয়, বিবাহত্তোর অনুষ্ঠান। আর তাছাড়া আপনার সুদর্শন ও চৌকষ ছেলেটির পাশে নববধুকে মঞ্চে দাঁড় করিয়ে যখন অভ্যাগতদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন তখন দেখেছি আমাদের মত অনেকের কাছেই বিষয়টি বেশ খারাপ লেগেছিল।

“কেন খারাপ লাগবে? আমি বুঝতে পারছিনা দাদা আপনি কি বলছেন?”

“না না বলছিলাম কি, নবদম্পতিকে অনেকটা ‘মা-ছেলে’র মতই লাগছিল কিনা তাই”

“মানে?”

“আপনি কি আপনাদের ভাটিরদেশের নোয়াখালী অঞ্চলের কথা কিছুটা বুঝেন?”

“হাঁ দিব্যি বুঝি, কিন্তু বলতে পারি না দাদা।”

“আচ্ছা তাহলে শুনুন নোয়াখালী অঞ্চলের একটি গানের কলি। আমার ঠাক্‌মা বলেছিল। দেশভাগের আগে তারা ওখানে ছিল কিনা। আশা করি আপনি গানের মর্মার্থ বুঝবেন।”

“হাঁ বলুন দাদা”

“হোলাত্তুনো মাঁইয়া ডাঙ্গর, এই বিয়ার নি ঢক আছে? আরো হুইনছি মাইয়া ইগা ট্রোক্কি উডে তাল গাছে” [ছেলের চেয়ে মেয়ে বড়, এই বিয়ের কি মজা আছে? আরো শুনেছি মেয়েটি নাকি এক লাফে উঠে তাল গাছে!!!], অর্থাৎ ধাঁড়ি মেয়েটির পাশে নাঁড়িকাটা সদ্যভুমিষ্ঠ ছেলেটিকে দেখতে অনেকেরই খারাপ লেগেছিল সেদিন।”

“কি করবো দাদা, এটা অষ্ট্রেলিয়া, এখানে ছেলেমেয়েদের পছন্দের উপর আমাদের কোন জোর খাটেনা। আর তাছাড়া মেয়েটির সাথে ‘ইন্টারনেটে’ চ্যাট করেই ওর পরিচয় হয়েছে। তবে মেয়েটি জাতে ভালো, দক্ষিন ভারতের নবাব টিপু সুলতানের বংশধর, সে জন্যেই আপত্তি করিনি।”

“ও, তাহলে নেটে’র বিয়ে? অর্থাৎ আপনার হাবাগোবা সোনার ছেলেটি ‘প্রেমের গর্তে’ পড়ার আগ পর্যন্ত মেয়েটি তার সুরাৎ ও বয়সের বিষয়ে তাকে ওয়াকেবহাল করেনি? নেটের বিয়েতে শুনেছি এধরনের ধড়িবাজি হামেশা হয়ে থাকে এবং অজ্ঞাত পরিচয়ের পাত্র/পাত্রিরা প্রায়ই মহত্মা গান্ধী অথবা টিপু সুলতানের বংশধর হয়ে থাকে। তবে যদি ‘নেটের বিয়ে’ হয়ে থাকে তাহলে এত বড় করে সিডনীতে সমাবেশটি না করলেই পারতেন। অন্যকোন উদ্দেশ্য ছিলনাতো দাদা?”

“আরে না, না তেমন কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তবে আমি দেখেছি সিডনীতে হামেশা বিবাদে লিপ্ত ও বিভক্ত দেশীভাইদের একাংশকে কোন অনুষ্ঠানে নেমন্তন করলে আরেকাংশ কখনোই আসেন না। অভিমান করেন কেন অন্যপক্ষকে দাওয়াত দেয়া হলো। কিন্তু আমার ছেলের অনুষ্ঠানে দল-মত নির্বিশেষে আমি সিডনীর সকল পক্ষকে নিমন্ত্রন করেছি এবং তারা প্রায় সকলেই এসেছেন।”

“দাদা, আপনি কি বাংলাদেশের তত্তাবধায়ক সরকার? সকলকে দল-মত নির্বিশেষে একছাদের নীচে কেন আহ্বান করেছেন? আপনি কি কোন রাজনৈতিক মধ্যস্থতাকারী? নাকি সিডনীতে আপনি নিজেকে সর্বজনগৃহীত বলে প্রমান করতে এ সমাবেশ করেছেন? নাকি আর কোন উদ্দেশ্য?”

“আ-ম-ম, আ-ম, আ-ম - - -”

“থাক্, আর বলতে হবে না। আপনাকে বিব্রত করার জন্যে দুঃখিত। আজ তাহলে ছাড়ি দাদা।”

ড: হেমন্ত কুমারের [ছদ্মনাম] সাথে সমবয়সী তারই এক সহকর্মী ড: হেমায়েত করিম [ছদ্মনাম] এর কিছুদিন আগে টেলিফোনে উপরোক্ত কথোপকথন হয়েছিল। বাংলাদেশ বংশোদ্ভুত ড: হেমায়েত তার একমাত্র ছেলের বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানে মাত্র আড়াইশত ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি হলে অবিবেচকের মত প্রায় সাড়ে চারশত অতিথিকে নিমন্ত্রন করে সম্প্রতি সিডনীতে একটি 'গরুর হাট' বসিয়েছিলেন। ড:হেমায়েত এত্তোলোক নেমন্তন কেন করেছেন, নেমন্তনপত্রে পিতা হিসেবে তিনি আমন্ত্রিতদের কাছে কি চেয়েছিলেন তা বিশ্লেষন করে অনেকে তার আসল উদ্দেশ্যটি শেষাব্দি উদ্ধার করেছেন। অনুষ্ঠানের জন্যে যে প্রতিষ্ঠানের হলটি তিনি ভাড়া করেছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর সুবাদে ডঃ হেমায়েত ধারন ক্ষমতারও অধিক অতিথিকে সেদিন গোয়ালঘরের মত ঠেঁসে ঠেঁসে ঢুকিয়েছিলেন। তা নাহলে পাবলিক লাইবেলিটি ও ইন্সুরেন্সের নানা ঝামেলার কারনে কেউ সাধারনত অষ্ট্রেলিয়াতে এধরনের অপকর্ম করতে সাহস পায়না।

কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রবাসীরা নানা ব্যাস্ততার ফাঁকে একটু আনন্দঘন পরিবেশ খুঁজে থাকেন। আর সেই আশাতে সকলে একত্রিত হন, নানা বিষয়ে পরস্পরের মতামত ও দুঃখ-সুখের আলাপ করেন। পাশ্চাত্য সভ্যতায় যাকে 'সোশ্যালাইজেশন' বলে থাকে। শুধুমাত্র খাওয়া এবং খাওয়ান্তে খাওয়া লেগে থাকা আঙুল চোষা বা তালু চাটার জন্যে কেউ একত্রিত হননা। বিনোদন ও সাচ্ছন্দে আড্ডা দেয়ার সুযোগ না থাকলে কোন অনুষ্ঠানই আরামদায়ক বা সুখকর হয়না।

ডঃ হেমায়েত তার ছেলের বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানের নেমন্তনপত্রে আমন্ত্রিত অতিথিদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন কেউ যেন উক্ত অনুষ্ঠানে 'বহনযোগ্য' কোন উপহার না আনেন অর্থাৎ 'ক্যাশ ওয়েলকাম'। নিমন্ত্রনপত্রে তিনি 'আশির্বাদ' শব্দটি ঘুনাক্ষরেও উল্লেখ করেননি। উদ্দেশ্য ছেলে'র 'স্বামী-ভিসা' মঞ্জুর হলে পুত্রবধুর সাথে মিলিত হতে ছেলে মার্কিন মুল্লুকে চলে যাবে। উল্লেখ্য আজকাল চেক বা ক্যাশ বহনকরার দরকারই হয়না। আধুনিক প্রযুক্তির সুবাদে নগদ অর্থ মুহুর্তেই ব্যাংক-টু-ব্যাংক পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে 'বোরাক' এর গতিতে চলে যায় বকধার্মিক ডঃ হেমায়েত তা জানতেন। দারুন বুদ্ধি!! সেজন্যেই 'যত বেশী অতিথি, তত বেশী লাভ' মনে রেখে তিনি স্বল্প খরচে প্রচুর কার্ড ছেপে সিডনীতে দেদারসে বিলিয়েছেন। আগত অতিথিরা পরস্পরের সাথে মিলিত হবে কি, তিলধারনের ঠাঁই ছিলনা পুরো হলে। অতিথিদের জন্যে মেইন মেনুর আগে কোন ড্রিঙ্কস, নাটস, চিপস বা অনট্রে টেবিলে ছিলনা। ভোজসভায় আমন্ত্রিতদের সকলকে অনাথাশ্রমের মত লাইন ধরে 'বুফে' খাওয়া নিতে হয়েছিল। ক্রোকারিজ বা আনুষঙ্গিক কাটলারিজ ব্যবহারে অনভ্যস্থ বাঙাল হেমায়েত তার অতিথিদেরকেও তা দেননি। ওয়ানটাইম প্লাষ্টিক থালা গেলাস দিয়ে তিনি শর্ট-কাট মেরে দিয়েছেন। বুফে নিয়ে টেবিলে ফিরে শান্তিমত খাবে কি, খেতে বসে একজনের কনুই ঠেকেছে আরেকজনের উদরে। ঠাসাঠাসি করে পাতানো পাশের টেবিলে বসা খাওয়ার সময় একজন নারী অতিথির সংবেদনশীল অংশে অসাবধানতাবশত আরেকজন দাদার কনুই লাগার মত দুর্ঘটনার কথা সেদিন শোনা গেছে। বিষয়টি ছিল অত্যন্ত লজ্জাজনক। প্রচন্ড ভীড়ের মাঝে বার বার শুধু মনে হয়েছিল কোন কাঙালীভোজ অথবা গরুরহাটে যেন সবাই এসেছে। প্রচন্ড অব্যবস্থাপনায় সকল অতিথিদের কাছে ডঃ হেমায়েতের আসল উদ্দেশ্যটা সেদিন পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল। পরে শোনা গেছে উক্ত অনুষ্ঠানে দাতা-অতিথিদের ক্যাশ উপঢৌকন থেকে ডঃ হেমায়েত নগদ তেইশ হাজার সাতশত ডলার উপার্জন [গ্রস-ইনকাম] করেছিলেন। অর্থাৎ কই মাছের তেলেই তিনি কই ভেজে নিলেন। ছেলের বিয়ের নামে মাঝখানে তিনি কিছু ব্যবসা করে নিলেন!!

গতমাসে ডাকযোগে আসা এরকম আরেকটি প্রবাসী-বাংলাদেশী বিয়ের নেমন্তনপত্র আবিষ্কার করা হয়। দেশ থেকে সস্তায় ছাপিয়ে আনা বিয়ের কার্ডের সাথে পাত্রপক্ষ অতি সযতনে আমন্ত্রিত অতিথির উদ্দেশ্যে বিখ্যাত রিটেইলার ডেভিড জোনসের একটি রেজিষ্ট্রেশন কুপন সেঁটে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আমন্ত্রনের পাশাপাশি তিনি দাতা-অতিথিকে বুঝিয়ে দিলেন কোন্ দোকান থেকে কী ধরনের উপহার কিনে তার ছেলের বিয়েতে আসতে হবে। এসব ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষ বা যেকোন একপক্ষ কোন বড় দোকানে গিয়ে 'গীফট কালেকশন'এর জন্যে আগে তাদের নাম রেজিষ্ট্রি করে আসে। আমন্ত্রিত ব্যক্তি নিমন্ত্রনপত্রের

সাথে প্রাপ্ত রেজিষ্ট্রেশন ও ফোন নং ধরে ঐ দোকানে যোগাযোগ করে তার পছন্দমত উপহার কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করলে উপহারটি দোকানদার তাদের তোষাখানায় জমা রাখে। বিয়ের দিন দোকানি কর্তৃপক্ষ সকল গিফট একত্রে তাদের দায়ীত্বে বিয়েবাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসে। প্রতিটি উপঢৌকনে দাতার নাম ও ঠিকানা উল্লেখ থাকে এবং তাতে বোঝা যায় কোন্ অতিথি নবদম্পতিকে আশির্বাদ করে কি উপহার দিয়েছেন। এক্ষেত্রে একটি সুবিধা হচ্ছে 'গিফট রিপিটেশন' হয় না, অর্থাৎ একই উপহার একাধিকবার আসার আশংকা থাকেনা। কারণ দোকানী কর্তৃপক্ষ 'দাতা-অতিথিকে' আগেই তা জানিয়ে দেন। বিংশ শতাব্দির মাঝামাঝিতে মার্কিন মুল্লুকে অর্থাৎ চার্চ এবং ক্লাবভিত্তিক সমাজব্যবস্থাতে এ প্রথা প্রথম প্রবর্তন হয়। তাদের দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক ব্যবস্থার কারণেই উক্ত পদ্ধতিটি আবিষ্কার হয়েছিল। বিয়ে-শাদীতে উপঢৌকনের উক্ত পদ্ধতি কাঁটা-চামচ আর ছুরি-কাঁচি দিয়ে খাদ্য গ্রহনকারী সমাজে মানায়। কব্জি ডুবিয়ে ও হাতের তালু চেটে খাওয়া ভেতো বাঙালীকে এগুলো মানায় না। কেউ হয়তবা বলবেন, "ওরা পারলে আমরা পারবো না কেন?" উত্তরে বলতে হয় উক্ত পদ্ধতীতে উপঢৌকন গ্রহনকারী পিতা/মাতা তাদের সন্তানের বিয়ের অনুষ্ঠানে যে আনন্দ বিনোদনের আয়োজন করেন এবং অতিথিদেরকে টেবিলে 'সিলভার সার্ভিস' দিয়ে যে পরিমানের অর্থ খরচ করে থাকে তা কি ঐ শ্রেনীর বাংলাদেশী অভিভাবকরা কখনো করেন? অতটুকু খরচের হিম্মত কার আছে? যারফলে শুধুমাত্র 'প্রাপ্তি' লাভের আশায় এসকল ধান্দাবাজ অভিভাবকরা ক্ষনিকের জন্যে অষ্ট্রেলিয়ান বা অ্যামেরিকান বনে যান। অর্থাৎ 'ত্যাগের' বেলায় বাংলাদেশী এবং 'গ্রহনের' বেলায় বিদেশী সেজে থাকেন। পাশ্চাত্য সভ্যতায় অনুষ্ঠানে আগত প্রতিটি অতিথিকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানিয়ে তাদেরকে নির্দিষ্ট টেবিলে এগিয়ে নেয়া হয়, পাত্রীর সাথে করমর্দন করে গালে গাল ঘঁষা, হালকা মিউজিকের সাথে টেবিলে বিভিন্ন ড্রিঙ্কস ও মুখরোচক হরেক রকমের বাদাম/চিপস পৌঁছে দেয়া এবং অতিথিরা কেউ সোমরস পান করতে চাইলে তাকে সেভাবে আপ্যায়ন করা এবং মেইন মেনুর আগে 'অনট্রে' সার্ভ করা হয়। দেশী কায়দায় কাউকে বিয়েবাড়ীতে দাওয়াত দিয়ে সরাসরি 'মেইন মেনু'র জন্যে লাইনে খাড়া করে এবং হাতে প্লাষ্টিকের থালা ধরিয়ে দিয়ে সাথে এক গেলাস বোরহানী ও খাওয়া শেষে জর্দা নামের একমুঠো রঙ মাখানো ভাত পিরিচে ছিটিয়ে অতিথিসৎকার হয় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার আদলে যদি কিছু করতেই হয়, তবে তা আদ্যোপান্ত করাই মনে হয় সমুচিৎ, শুধুমাত্র স্বার্থপরের মতো উপঢৌকন আদায়ের নব্য প্রকৃয়ার সুযোগ গ্রহণে সেটা ব্যবহৃত হবে কেন? আর এক্ষেত্রে যদি ধর্মের বিষয়টি ওঠে, তবেতো পাশ্চাত্য পদ্ধতি পালনের প্রশ্ন কোনভাবেই আসেনা। সেক্ষেত্রে আশির্বাদ করে ধর্মিয় পদ্ধতিতে নবদম্পতিকে তথাকথিত বৈবাহিক কায়দা কানুন শেখার উৎকৃষ্ট বই বলে পরিচিত এক কপি 'মোকছুদুল মোমীন' বা বাংলায় অনুদিত, বুখারী শরীফ অথবা কোরান শরীফ এর মত উপহার দেয়া উচিৎ। এধরনের পবিত্র পুস্তক উপহার দিলে নবদম্পতি বা তাদের পিতামাতা কারো নাখোশ হওয়ার কথা নয়, কারন তাতে আল্লাহতালা নবদম্পতির উপর গোস্বা না হয়ে খুশীই হবেন সমাধিক।

এধরনের বাংলাদেশী নিমন্ত্রনগুলোতে হৃদয়গত তাড়নায় অতিথিরা উপস্থিত হলেও নিমন্ত্রনদাতার লোভাতুর দৃষ্টি সর্বদা থাকে অতিথির হৃদয়ের ঠিক উপরে অবস্থিত জেবের দিকে। হতভাগা অতিথি হতাশ হয়ে তখন শুধু মনে মনে ভাবতে থাকে, 'আমার দৃষ্টি তোমার হৃদয়ে বন্ধু, কিন্তু তোমার দৃষ্টি আমার জেবে!!'

তবে সকলেই এক নয়। শত নোংরা ও নষ্টের মাঝেও কিছু ভালো ও ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। তাদের সংখ্যাও নগন্য নয়। সিডনীর অনেকেই হয়তবা ক্যালীভেইল এর ইঞ্জিনিয়র শামসুল হকের ছেলের বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানের কথা মনে আছে। বিশাল আয়োজনের অনুষ্ঠানটি হয়েছিল আনুমানিক ২০০৩ সনের কোন এক সময়ে চেরীব্রুক কমিউনিটি সেন্টারে। অনুষ্ঠানটি দেখে মনে হয়েছিল, করতে হলে এরকম অনুষ্ঠানই করা উচিত। অনুষ্ঠানটির আদ্যোপান্ত কোনাংশে সৌজন্যতা বা সমাদরের কোন অভাব ছিল না। তাদের নেমন্তনপত্রে 'আশির্বাদ' ছাড়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোথাও উপঢৌকনের কথা ছিলনা। তবুও প্রায় সকল অতিথি তাদের হৃদয়ের ভালোবাসা ও স্নেহে সিক্ত করেছিল স্বল্পবয়স্ক সেই নবদম্পতিকে।

উল্লেখ করার মত একটি বাংলাদেশী বিয়ে সেদিন সিডনীর বুকে হয়েছিল। বছর চারেক আগে ঠিক একই মানের আরেকটি বাংলাদেশী বিয়ে সিডনীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ডঃ আয়াজ চৌধুরী (খোকন) এর বড় বোন রোক্সানা বেগম তার মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন সিডনীর একটি পাঁচতারকা ভেন্যুতে। শোনা গেছে উক্ত বিয়েতে সৌখিনতা ও সৌজন্যতার কোনই কমতি ছিল না। আগত অতিথিরা সম্মানিত হয়েছেন তাদের আন্তরিক আপ্যায়নে। রোক্সানা বেগম তার মেয়ের বিয়ের নেমন্তনপত্রের কোনস্থানে অথবা কোন্ দোকান থেকে কি উপঢৌকনটি কিনতে হবে তা উল্লেখ করেননি বলে শোনা গেছে। তবুও নবদম্পতির প্রতি অভ্যাগতদের ভালোবাসার কোন কার্পণ্য সেদিন ছিলনা। পার্বত্য চট্টগ্রামের যুবক মং থিং জুলাই ২০০৪ সনে তার বিয়ের অনুষ্ঠানটি উদযাপন করেছেন প্যারামাট্টার একটি বিলাসবহুল হলে। অতিথিদের সাচ্ছন্দের কথা বিবেচনা করে ধারন ক্ষমতার বাইরে একজন লোকও তিনি নেমন্তন করেননি। অষ্ট্রেলিয়াতে বন্ডপেপারে ছাপানো এবং ভ্যালভেট কাপড়ে মোড়ানো তার মুল্যবান বিয়ের কার্ডেও অতিথিদের কাছে কোনভাবে তিনি 'গীফট-ভিক্ষে' চাননি। বাংলাদেশের উপজাতি সদস্য হয়েও তিনি অষ্ট্রেলিয় পরিবেশে সেদিন প্রমান করে দিয়েছেন একটি বিয়ের অনুষ্ঠান ক্যামন হওয়া উচিত। আরেকজন বাংলাদেশী পিতা গত ২০০৫ সনের অক্টোবরে সিডনীতে উড়ে এসে হাজার হাজার ডলার খরচ করে অত্যন্ত আড়ম্বরভাবে প্যারমাট্টার একটি সম্ভ্রান্ত ভেন্যুতে তার একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি বাংলাদেশের বিখ্যাত 'শিপিং লেজেন্ড' বিপ্লব কান্তি চৌধুরী [বি. কে. চৌধুরী]। বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা জনাব চৌধুরী সিডনী এসে ঘুনাক্ষরেও 'কইয়ের তেলে কই ভাজা'র কথা চিন্তা করেননি। উপরন্ত অতিথিদের আরাম ও সাচ্ছন্দের কথা বিবেচনা করে তিনি তিনশত আসন বিশিষ্ট হলটিতে মাত্র আড়াইশ জন অতিথি আপ্যায়নের আয়োজন করেছিলেন। আমন্ত্রিত অভ্যাগতরা তার উদার সেবা ও সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়ে 'বাহ্ বাহ্' করেছিলেন আর বলেছিলেন, "খোদ অষ্ট্রেলিয়ান সমাজ ব্যবস্থাতেও একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে কোন অভিভাবকরা অতিথিদের এত সমাদর করেন না।" তার মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে গান-বাজনা ও নানারকম বিনোদনের আয়োজন ছিল মনে রাখার মত। সোমরস থেকে শুরু করে ডায়েট-কোলা, হরেক রঙের জলের অবারিত স্রোতধারায় অবগাহিত হয়েছিল অনেক অতিথি সে বিয়ের অনুষ্ঠানে। বাংলার সোঁদা মাটিতে জন্মগ্রহন করেও জনাব চৌধুরী সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন 'ওয়েষ্টার্ন এ্যটিকেট বা ম্যানার' কাকে বলে এবং বাঙালী হয়েও পাশ্চাত্য সভ্যতায় কিভাবে নিজেদের মানিয়ে নিতে হয়। অজানা এরকম আরো অনেক বাংলাদেশী অষ্ট্রেলিয়ায় আছেন যারা তাদের সন্তানদের বিয়ের অনুষ্ঠান আরো জৌলুস ও সৌজন্যতা রেখে উদযাপন করেছেন। তাদের নাম ও বিস্তারিত বিবরণ জানা নেই বলে এখানে উল্লেখ করতে পারিনি, সে জন্যে দুঃখিত। তবে এটুকু বিশ্বাস করি সিডনীতে অনেক ভালো বাংলাদেশী পিতামাতা আছেন যাঁরা অত্যন্ত আধুনিক, রুচিসম্পন্ন এবং সম্মানীয়। এ শ্রেণীর বাংলাদেশীদেরকে সিডনীর কোন অনুষ্ঠানে বা সমাবেশে কালেভদ্রে দেখা যায়। কারণ হলুদ সোনা ডুবে থাকে তার নিজস্ব ভারে, থাকে দৃষ্টির অগোচরে; কিন্তু হলুদ বর্নের 'মনুষ্য-ত্যাগ' ভেসে বেড়ায় যত্রতত্র এবং দেখা যায় সহজে।

শত শত অতিথির উপস্থিতিতেও পর্যাপ্ত ফাঁকা স্থান ছিল হলে, পরিচিতির সময় ঘুরে ঘুরে প্রায় সকল অতিথির সাথে ওরা ছবি তোলেন, লেখক দম্পতির সাথে মং থিং দম্পতি

বনি আমিন, ২১/০২/২০০৯